

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী বাংলাদেশের করণীয়

মোতাহার হোসেন

বাংলাদেশ বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ধারাবাহিত ভাবে অব্যাহত থাকায় উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হচ্ছে। একই সঙ্গে মানুষের জীবন মানের উন্নতি ও গড় আয়, গড় আয়ু বাড়ছে। সময় উপযোগী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন, গড় আয়, গড় আয়ু প্রভৃতির বিবেচনায় জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উন্নয়ন নীতিমাল বিষয়ক কমিটির (সিডিপি) বিগত ২৬তম অধিবেশনে ত্রিবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণে তিন সূচকেই টানা তৃতীয় বারের মতো উত্তীর্ণ হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। চলতি বছরের ৪-৮ মার্চ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ হলে শুদ্ধমুক্ত পণ্য রপ্তানীর সুযোগ হারাবে দেশ। এমনি অবস্থায় আমাদের অর্থনীতি সুরক্ষা, রপ্তানী আয় অব্যাহত রাখা, রপ্তানী মুখী শিল্পে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা নতুন করে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। কাজেই এখন থেকে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে রপ্তানী মুখী তৈরী পোশাকের পরিবর্তে রপ্তানী পণ্যের বহুমুখী করণ, বৈচিত্র্য আনা এবং নতুন রপ্তানী বাজারের সন্ধান করা। পাশাপাশি আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আরেকটি অন্যতম খাত হচ্ছে শ্রম শক্তি। কিন্তু আমাদেরও শ্রম শক্তির বেশীর ভাগই হচ্ছে অদক্ষ, অপেশাদার এবং স্বল্প ও অশিক্ষিত। এর পরিবর্তে আমরা যদি স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত, দক্ষ, পেশাদার শ্রম শক্তি রপ্তানী করতে পারি তাহলে এই খাত থেকে বছরে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা তথা রেমিটেন্স অর্জন করা মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। অবশ্য বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণ পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দফতর, অধিদফতর, ব্যবসায় সংগঠনের প্রতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনুস। বাণিজ্য, পরিকল্পনা, শ্রম কর্মসংস্থান, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ এবং অর্থমন্ত্রণালয় ইতোধ্যে প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং রোড ম্যাপ প্রণয়নসহ বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সম্ভাবনায়ম নতুন রপ্তানী খাত হিসেবে সুস্বাদু আম, পেয়ারা, ড্রাগনফল, লটকন, লেচু, জামরুল, কাঁঠাল, লেবু, আনারস, পদ্মার ইলিশ, টমেটো, পাটশাক, লালশাক, পুই শাক, মিষ্টি কুমড়া, বালি কুমড়া, বিভিন্ন প্রজাতির মিটাপানির ২০ রকমের মাছ, আলু, পান, লতি, কচুসহ প্রায় দুই ডজন তরি ভরকারি রপ্তানীর বাজার কাজে লাগাতে ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার প্রয়োজনীয় কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামছে।

জাতিসংঘের আয়োজনে ১৯৭১ সালে এলডিসি তালিকা প্রণয়নের পর থেকে এযাবৎ এলডিসি থেকে উত্তরণ হওয়া সাতটি দেশ এবং উত্তরণের প্রক্রিয়াধীন ছয়টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশই একমাত্র সদস্য রাষ্ট্র, যেটি টানা তিন বারের মূল্যায়নে সকল সূচকে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। অবশ্য ইতোমধ্যে এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে জাতিসংঘ। ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বরই হচ্ছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম বৈঠকের ৪০তম প্লেনারি সেশনে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আর এরিমধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে পরবর্তী ধাপে উত্তরণের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করল। অবশ্য বাংলাদেশের পাশাপাশি লাওস এবং নেপালও উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উপরোল্লিখিত এই তিন দেশ উত্তরণের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর প্রস্তুতির সময় পাবে।

প্রসঙ্গত: গত শতকের শেষ দিকে বিশ্বে এলডিসি ধারণার জন্ম নেয়। ১৯৭১ সালের ১৮ নভেম্বর প্রথম জাতিসংঘ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা প্রণয়ন করে। প্রারম্ভিক তালিকায় ২৫টি দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে ৪৬টি দেশ এলডিসি তালিকাভুক্ত। মাথাপিছু কম জাতীয় আয়, অনুন্নত মানবসম্পদসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিম্ন সূচকের দেশগুলোই এলডিসির অন্তর্ভুক্ত। সিডিপি তিনটি সূচক যথা মাথাপিছু জাতীয় আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচকের ভিত্তিতে তিন বছর পরপর স্বল্পোন্নত দেশগুলোর আর্থসামাজিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের বিষয় পর্যালোচনা করে।

কোনো সদস্য রাষ্ট্র সিডিপির পরপর দুইটি ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে উপরোল্লিখিত তিনটি সূচকের যে কোনো দুইটির নির্ধারিত সীমা অর্জন করতে পারলে বা মাথাপিছু জাতীয় আয়ের নির্ধারিত সীমার দ্বিগুণ (চলতি ২০২৪ সাল থেকে এটি তিন গুণ করা হয়েছে) অর্জন করতে পারলে সিডিপি ঐ দেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ করে থাকে। সিডিপির সুপারিশ প্রাপ্তির পর ঐ বছরের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে রেজুলেশনের মাধ্যমে দেশটিকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করে এবং উত্তরণের সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে একটি দেশ চূড়ান্তভাবে উত্তরণের পরও উত্তরণকাল হিসেবে প্রস্তুতির জন্য আরো ৫ বছর সময় পেয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে এলডিসি তালিকাভুক্ত হয়। ২০১৮ সালের ১২-১৬ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত সিডিপির ২০তম অধিবেশনের ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে বাংলাদেশ প্রথম বারের মতো এলডিসি থেকে উত্তরণের মাপকাঠি অর্থাৎ তিনটি সূচকেই নির্ধারিত সীমা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ২০২০ সাল থেকে শুরু হওয়া বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেকটা হেঁচট খায়। কিন্তু বাংলাদেশ করোনা মহামারির ধাক্কা সাফল্যের সঙ্গে সামলে উঠেছে, একই ভাবে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির চাকাও সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। ফলে ২০২১ সালের ২২-২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সিডিপির ২৩তম অধিবেশনের ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকেরই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়। টানা দুটি ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে সকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করায় সিডিপি বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক) বরাবরে সুপারিশসহ প্রতিবেদন পাঠায়। কিন্তু বিগত করোনা মহামারির কারণে বাংলাদেশ দুই বছর বর্ধিত সময়ের আস্থান জানালে ২০২১ সালের ১১ নভেম্বর সাধারণ পরিষদ পাঁচ বছর প্রস্তুতিমূলক সময় দিয়ে এলডিসি উত্তরণ সংক্রান্ত ইকোসকের প্রতিবেদন

রেজুলেশনের মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করে। কোভিড-১৯-এর ধকল সামলে উঠতে বরাদ্দকৃত পাঁচ বছর প্রস্তুতিমূলক সময় যথেষ্ট কি না, তা পর্যালোচনার জন্য অনুমোদিত রেজুলেশনে ২০২৪ সালের সিডিপির পরবর্তী ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নেও বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্লেষণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সিদ্ধান্তের আলোকে ৪-৮ মার্চ, সিডিপির ২৬তম অধিবেশনে নির্ধারিত তিনটি সূচকের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে আবারও মূল্যায়ন করা হয়।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষ জনশক্তি তথা মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে দেশের সব উপজেলায় কারিগরি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ জনবল তৈরিতে সরকার নানা উদ্যোগ ও কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় আইসিটি পার্ক ও হাইটেক পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। সরকারের পরিকল্পিত এসব পদক্ষেপের কারণে তরুণদের মধ্যে আউটসোর্সিংয়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছে। প্রতি বছর আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে, যা খুবই আশাজনক। এছাড়া, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিটি উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) নির্মাণ করা কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়নের অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক কূটনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভৌগোলিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে অবস্থিত দেশের নিম্নাঞ্চল-উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উদ্ভূত অনিয়মিত আবহাওয়ার ধরণ থেকে মারাত্মক প্রভাবের সম্মুখীন হয়। এই চ্যালেঞ্জগুলো প্রশমনে আন্তর্জাতিক ফোরামের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এই বিষয়গুলো বাস্তবায়নে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে কাজ করছে। একই সঙ্গে এসব বিষয়াবলি প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী হিসেবে পাশাপাশি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে এবং জলবায়ু প্রভাবের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের এই প্রচেষ্টাকে এর জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (BCCSAP) দ্বারা আভারস্কার করা হয়েছে। যা জলবায়ু অভিযোজন এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পদক্ষেপের রূপরেখার বহিঃপ্রকাশ। এছাড়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP), বিশ্বব্যাংক এবং বিভিন্ন দাতা দেশগুলির মতো সংস্থাগুলির সাথে অংশীদারিত্ব যাতে জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন দ্রুত ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা যায়। পাশাপাশি নবায়নযোগ্য শক্তির প্রচার করা যায় এবং জলবায়ু ধাক্কাগুলির জন্য স্থিতিস্থাপক কৃষি অনুশীলনগুলিকে উন্নত করা যায়। পাশাপাশি দেশের সম্ভাবনাময় ওষুধ শিল্পের প্রসার, উন্নয়ন এবং ওষুধের গুণগত মান উন্নত করে অধিক হারো রপ্তানীর উদ্যোগ এবং ওষুধ রপ্তানীর নতুন নতুন বাজারের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে এই শিল্প প্রসারে সরকারের অধিক গুরুত্ব ও নজর দেয়া দরকার।

কূটনৈতিকভাবে, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনায় গ্লোবাল সাউথের স্বার্থের পক্ষে ওকালতি করেছে, ইকুইটি, আর্থিক সহায়তা, এবং উন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের উপর জোর দিয়েছে। এই অবস্থান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির একটি জোট ক্লাইমেট ভারনারেল ফোরাম (CVF) এর নেতৃত্বকে প্রতিফলিত করে। বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপী জলবায়ু সংকট নিরসনের জন্য সকল রকম প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে যে এটি নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক নীতি এবং কর্মসূচিগুলি দ্রুত পরিনতির দিকে এগিয়ে নেয়া। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে দেশের উন্নয়ন অগ্রাধিকার এবং স্থিতিস্থাপকতা-নির্মাণের প্রচেষ্টার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ভাবে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। জলবায়ু প্রভাবের প্রতি দেশের দুর্বলতা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের প্রতিশ্রুতির কারণে এই প্রচেষ্টাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিযোজন এবং স্থিতিস্থাপকতা বিল্ডিং: জলবায়ু প্রভাবের বিরুদ্ধে স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ অভিযোজন ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার জন্য প্রাথমিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ, বাঁধ এবং ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে উপকূলের মানুষ, সম্পদ ও পশু পাখির জন্য পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের মতো জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ এবং জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি অনুশীলনের প্রচার ও চর্চা অব্যাহত রাখা।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর গুরুত্বারোপ: নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণ কমানোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎপাদনের জন্য উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে এর মধ্যে রয়েছে সৌরবিদ্যুতের উদ্যোগ। এই লক্ষ্যে দেশের গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতের সরবরাহ ও প্রাপ্যতা সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ধীরে ধীরে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানোর উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে মোট জ্বালানীর ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানী থেকে ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার। তবে এই কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের পক্ষ থেকে তাগিদ দিলেও বিপুল পরিমাণ অর্থের দরকার কিন্তু সেই অর্থের সংস্থানের ব্যাপারে সাড়া নেই তাদের। কাজেই এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে সম্পন্ন করা একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নব নিযুক্ত উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাউজুল কবির খান। অবশ্য এ নিয়ে দেশের জ্বালানী বিশেষজ্ঞরাও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা: জীববৈচিত্র্য রক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন রক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ কারণে ইতিমধ্যে জলবায়ু অভিযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এই বন। একই সঙ্গে দেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে ঝড় ও ক্ষয় থেকে রক্ষা করে চলেছে। দেশের এই মূল্যবান বাস্তুতন্ত্র এবং এর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য টেকসই ব্যবস্থাপনা অনুশীলন ও বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে।

আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব এবং প্রয়োজনীয় অর্থায়ন: বাংলাদেশ জলবায়ু প্রকল্পের জন্য আর্থিক সংস্থান এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা জোগাড় করতে বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক, দাতা দেশ এবং বেসরকারি সংস্থা সহ আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করে। এই অংশীদারিত্বগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি বাংলাদেশের স্থিতিস্থাপকতাকে শক্তিশালী করতে প্রযুক্তি হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান ভাগ করে নেয়ার সুবিধা দেয়। সামগ্রিকভাবে, আন্তর্জাতিক কূটনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন, এবং টেকসই উন্নয়নের প্রতি বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্থিতিস্থাপকতা অর্জন, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রচারে তার প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়া অপরিহার্য।

#

লেখক: সাংবাদিক, সাধারণ সম্পাদক-বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম

পিআইডি ফিচার